গোধূলীর গান -৪

পুর্বের লেখাটি পড়তে এখানে টোকা মারুন

হিফজুর রহমান

আমার মন ভালো নেই.....

বেশ কিছু দিন ধরেই মন খুব ভালো নেই। মুল্যস্ফীতি বাংলাদেশে এখন নৈমিত্তিক বিষয় অদ্ভুত এক পরিস্থিতি বিরাজ করছে দেশে। রমজান মাস শুরু হবার এক মাস আগে থেকেই আমাদের অতি যোগ্য সরকার (!) তীব্র নিনাদে বলতে শুরু করেন, রমজান মাসে জিনিষপত্রের দাম বাড়বেনা। সেজন্যে সরকার সবরকম ব্যবস্থা নিয়েছে। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ও সেই সুরের রেশ ধরে বলেন, আমরাও সরকার সকল প্রকারের সহযোগিতা করবো-যাতে করে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম না বাড়ে। তারা এমন কথাও বলেন, বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্যে তারাও সক্রিয় ভূমিকা রাখবেন। হা হতোস্মি! রোজা শুরু হবার বেশ আগেই রমজান মাসে যে দ্রব্য গুলোর চাহিদা কিছুটা বেশি হয় সেগুলোর দাম লাগাম ছাড়া ঘোড়ার মতো দৌড়ুতে শুরু করলো। সেই পাগলা ঘোড়ার লাগাম আর কে ধরে? অনেক রকম হু..হুংকার উঠলো সরকারের বিভিন্ন মাধ্যম থেকে। ফলাফল অশ্বডিম্ব। মিডিয়ার সাথে সাক্ষাতকারে বাজারের এক ব্যবসায়ী বললেন, বাণিজ্য মন্ত্রীকে কথা কম বলতে বলেন। উনি কথা বললেই বাজারে দাম বাড়ে। এবার আর দাম বাড়াবাড়ির বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলোনা। সামনেই ইদ। সংযমের মাস রমজানেই মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত। সামনের ঈদ তারা কি করে করবেন জানিনা। সরকারে যাঁরা আছেন তাঁরা সাধারন মানুষের কথা মোটেও বোঝেন কি না সেও জানিনা। তবে সাধারন মানুষ আবারো ভোট দেয়ার সুযোগ পাবেন, তখন কি হবে সেটাও জানিনা। এখন আমরা সড়ক পথে চলতে পারবোনা। বিদ্যুতের সংকটে স্থবির হয়ে যাবো। সেই সাথে যানজটের স্থবিরতাতো রয়েছেই। তার ওপর রয়েছে সর্বগ্রাসী দুর্নীতি। এই দুর্নীতি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে একেবারে নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত কোথায় নেই? জানিনা আমাদের তুমুল মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত দেশটির গন্তব্য কোথায়?

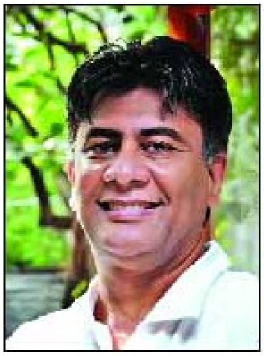

বাংলাদেশে এখন সর্বাধিক আলোচিত বিষয় বেহাল রাস্তা এবং দুর্ঘটনার পর দুর্ঘটনা এবং যোগাযোগ মন্ত্রী ও নৌ-পরিবহন মন্ত্রী আবুল ও শাহজাহানের নির্লজ্জ মিথ্যাচার। মানিকগঞ্জের ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় ধীমান চলচ্চিত্র নির্মাতা তারেক মাসুদ এবং মেধাবী সংবাদকর্মী মিশুক মুনীর-এর মৃত্যু সারা দেশকে নাড়া দিয়ে গেছে। এসব খবর নিশ্চয়ই সিডনীবাসি বাঙালীদের জানা হয়ে গেছে। সেটা নিয়ে আর কথা না-ই বলি। আমার বর্তমান কর্মসূত্রে সারাটা দেশ ঘুরে বেড়াতে হয়। গত শনিবার ১৩ আগস্ট ২০১১ আমি এবং আমার প্রশিক্ষক দল যাচ্ছিলাম বরিশাল। বরিশালে একটি, গোপালগঞ্জে একটি এবং ফরিদপুরে একটি প্রশিক্ষণ শেষে ফিরে আসবো ঢাকায় সপ্তাহান্তে। আমাদের মাইক্রোবাস মানিকগঞ্জ পার হয়ে যাবার খানিক পরেই তারেক মাসুদ ও মিশুক মুনীরদের মাইক্রোবাস দৃর্ঘটনায় পড়ে। অল্প কিছুক্ষণ পরই অনীশ দা জানিয়ে দিলেন এই খবর, বললেন, 'হিফজুর ভাই, আপনাদের মাইক্রোবাসের ড্রাইভারকে সাবধানে চালাতে বলবেন।' সেকথায় আমার কোন মনোযোগ ছিলনা। স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম

ওদের অপঘাতে মৃত্যুর কথা শুনে। তারেক মাসুদের সাথে জানাশোনা ছিল অল্প। কিন্তু, তার কাজের সাথে পরিচয় ছিল অনেকই। ঢাকার গ্যোটে ইন্সটিটিউটে ওর মুক্তির গানের প্রিমিয়ার শো দেখতে দেখতে আর অশ্রু সংবরণ করতে পারছিলামনা। বারবারই কেবল মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যাচ্ছিলো। আড় চোখে দেখছিলাম, আমার বয়সের এবং আমার চাইতে বেশি বয়েসের অনেকেরই চোখে জল। শো শেষে বাইরে এসেই তারেককে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। বলেছিলাম, 'ধন্য আপনার কাজ'। তারেকও অনেকই ধন্যবাদ জানিয়েছিল।

মিশুক মুনীরের সাথে দেখা ইটিভি'র যাত্রালগ্নে, সেই ১৯৯৮ সালে। আমিও যুক্ত হয়ে পড়েছিলাম ইটিভি'র বিশাল কর্মযজ্ঞে...সাইমন ড্রিং-এর বিশাল আস্থা মাথায় নিয়ে। তখন দেখেছিলাম সংবাদ পাগল মিশুক মুনীরকে। অস্ট্রেলীয় দুতাবাসে কাজ করার কারণে ইটিভি'র সাথে সম্পর্ক একটু ঢিলেঢালাই ছিল। কিন্তু. মিশুক মুনীরের সাথে ফোনালাপ হতো প্রায়শঃই। মুনীর কানাডা থেকে ফিরেছে এ-খবরটা পেয়েছিলাম মুন্নী সাহা আর প্রভাষ আমিনের (এটিএন নিউজের সংবাদ বিভাগের প্রধান ও বার্তা সম্পাদক যথাক্রমে) কাছ থেকে। বেশ কিছুদিন থেকেই ভাবছিলাম, একদিন যাবো, মিশুকের সাথে দেখা করতে। ব্যস্ততার কারণে যাই-যাই করেও যাওয়া হয়নি। তখন ভাবিনি আর দেখা হবেনা ওর সাথে।

ওদের মৃত্যু নিয়েও রাজনৈতিক কূটকচাল কম চলছেনা। চলছে সরকারের তরফ থেকে, বিশেষ করে নির্লজ্জ যোগাযোগ মন্ত্রী ও নৌ-পরিবহন মন্ত্রীর ক্রমাগত মিথ্যাচার। অসহায় বোধ করি নিজেকে। কোথায় চলেছি আমরা! এই দেশটার গন্তব্য কোথায়, আমি অর্থনীতির ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও বুঝতে পারছিনা। আপনারা কি বুঝতে পারছেন? খাদ্যে বিষ, সড়ক বেহাল, অশিক্ষিত চালকদের হাতে জিম্মি দেশের মানুষ, পুলিশ চোর-ডাকাতে পরিণত হচ্ছে প্রতিনিয়তঃই, রাজনীতিবিদরা মানুষকে নিয়ে ব্যবসায় নিরত এবং দুর্নীতির করালগ্রাস কুরে কুরে খাচ্ছে দেশের মানুষকে। কি হবে আমাদের?

[প্রিয় পাঠক, কোনই অজুহাত নয়। এই ক্রমাগত মন খারাপ করা সময় এবং কর্ম ব্যস্ততার কারণে এই ক'দিন আপনাদের মুখোমুখি হতে পারিনি। এর মধ্যে বনি জানালো, সিডনীতে আমার লেখার নাকি অনেক পাঠক আছেন এবং তারা আমার লেখা মিস করছেন। আমার অবশ্য সেটা বিশ্বাস হয়না। কারণ, গতবার লেখা শুরু করার পর কিছু প্রতিক্রিয়া পেয়েছিলাম, ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুইই। এবার একটাও প্রতিক্রিয়া নেই। মনে হচ্ছে খুব একটা আগ্রহ তৈরী করতে পারিনি আমি। কে জানে! আরো কিছু দিন লিখে যাবার ইচ্ছে আছে। তারপরও কোন আগ্রহ তৈরী না করতে পারলে না হয় যতিই টানবো, কি বলেন সবাই?]

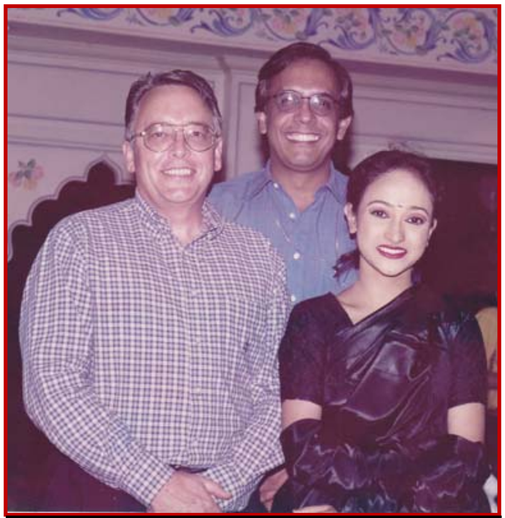

`B nvRvi mv‡j A‡÷ªjxq msm`xq `‡ji evsjv‡`k mdiKv‡j (Avgvi mg‡q wØZxq) Zv‡`i R‡b¨ †`qv GKwU mseabvq XvKvi wewkó bZ¨wkíx I Awf‡bÎx wbkvÖi mv‡_ Avwg I ievU© wdb

একজন রবার্ট ফ্লিন ও অস্ট্রেলীয় দুতাবাসের কিছু কথা....

১৯৯৯ সালের আগস্ট মাসে ঢাকাস্থ অস্ট্রেলীয় দুতাবাসে হাই কমিশনারের দায়িত্ব নিয়ে এলেন রবার্ট ফ্লিন। আমি তখন অস্ট্রেলীয় দুতাবাসের সবচেয়ে সিনিয়র বাঙালী অফিসার। স্বভাবতঃই আমার সাথে

খুবই দ্রুত তার সম্পর্ক গড়ে উঠলো, অন্যদের মতোই। কিন্তু, উনি আসার বোধহয় একমাস পরেই অস্ট্রেলিয়া চলে গিয়েছিলাম প্রায় দেড়মাসের জন্যে। ফিরে আসার পরও বেশ চমৎকার যেতে লাগলো আমার আর মিঃ ফ্লিনের সম্পর্ক। আসলে সম্পর্কটাতো কেবলই কাজের সম্পর্ক। আমার যোগ্যতা নিয়ে কখনোই কারো কোন প্রশ্ন ছিলনা, যদিও আমাকে সবসময়ই পরীক্ষার চিকন ও ধারালো সুতোর ওপর দিয়ে হাঁটতে হতো। কারণ, আমার নানাবিধ দায়িত্ব। পলিটিক্যাল/ইকনমিক অফিসারের দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও আমাকে একাধারে ডিফেন্স লিয়াজোঁ, পুলিশ লিয়াজোঁ অফিসার, কালচারাল ও ইনফরমেশন অফিসারের দায়িত্ব পালন করতে হতো। সেই সব বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতো ছিল আরেকটি ভয়ংকর দায়িত্ব। সেটা হলো, অস্ট্রেলিয়ায় যারা প্রটেকশন ভিসা চাইতেন তাদের কেসগুলোর তদন্ত করা এবং ঢাকায় যারা মাইগ্রেশনের জন্যে আবেদন করতেন তাদের কাগজপত্র যাচাই করা। এই মাইগ্রেশন আবেদনকারীদের অধিকাংশই ছিলেন ‘পিটার গে’ (ছদ্মনাম) নামের একটি চরিত্রের ক্লায়েন্ট বা শাদা বাংলায় “মক্কেল”। একবার উকিল ‘পিটার গে’র জমা দেওয়া অনেকগুলো সার্টিফিকেট (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েশন) যাচাই করতে গিয়ে আমি ‘পিটার গে’র শত্রুতা কিনলাম। কারণ, এক দঙ্গালেই আমি প্রায় সত্তরটি জাল সার্টিফিকেট পেয়েছিলাম (একজন জাকির খান অবশ্য আমার অমনোযোগিতার সুযোগে পার হয়ে গিয়েছিল সেই সময়, যে এসএসসি পাশও করেছে কি না সন্দেহ-তার কথা পরে বলবো)। ওই ধাক্কাতেই উকিল ‘পিটার গে’র ঢাকার মনপোলী ব্যবসা প্রায় চৌপাট হতে বসলো। আমার সুপারভাইজর ষ্টিফেন জী বললো, ‘হিফজুর একেবারে বাঘের লেজে পা দিয়ে ফেলেছো। ‘পিটার গে’ থেকে সাবধান, ওর রীচ অনেক দূর’। কিন্তু, আমি তো আমার দায়িত্ব থেকে পিছপা হতে রাজি নই। পরে জানতে পেরেছিলাম, ‘পিটার গে’ অস্ট্রেলীয়ান গে-কমিউনিটির একজন বড় নেতা।

সবাই ভাবতে পারেন, ধান ভানতে শিবের গীত গাইছি কেন? কারণ আছে। আমার যাবতীয় “অপ-তৎপরতা”র কারণে ‘পিটার গে’র ঢাকায় আসা এবং ঢাকার ব্যবসা প্রায় বন্ধই হয়ে গেল। অনেক দিন পারও হয়ে গেল। এরই মধ্যে ‘পিটার গে’ কয়েকবারই অস্ট্রেলীয় ইমিগ্রেশন ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে দুর্নীতির দায়ে আমাকে ফ্রেম করবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ব্যর্থ হয় আমার সততার সাহসের কাছে। এই সব ঘটনা ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত চলে। তার আগে প্রায় দুই বছর ‘পিটার গে’র আর ঢাকায় আসা হয়নি। কিন্তু, রবার্ট ফ্লিন হাই কমিশনার হয়ে আসার পরই ‘পিটার গে’র তৎপরতা আবার সচল হলো। কারণ, ফ্লিনও একজন গে। টুকটাক মাঝে মধ্যেই লাগতে লাগলো তার সঙ্গে আমার। শেষটায় ভয়ংকর রূপ ধারণ করলো আমাদের লড়াই। তখন ঢাকাস্থ দূতাবাসে অস্ট্রেলীয় সরকারের ডাইরেক্ট এইড প্রোগ্রামের যে কমিটি ছিল, তার সদস্য সচিব ছিলাম আমি। একবার রবার্ট ফ্লিন খাগড়াছড়িতে একটা প্রকল্প দেখতে যাবেন তিনি। আবদার ধরলেন, ‘আমি চট্টগ্রাম থেকে খাগড়াছড়ি পর্যন্ত এতদূরের রাস্তা (তিন ঘন্টার রাস্তা আসলে) সড়কপথে যেতে পারবোনা। হেলিকপ্টার ভাড়া করো। হতবাক হলাম। বলে কি ব্যাটা! ফিজিতে ক’দিন রাষ্ট্রদূতের চাকুরী করা লোক হেলিকপ্টারে করে যাবে প্রকল্প দেখতে, তাও আবার মাত্র সাড়ে সাত লাখ টাকার প্রকল্প! উনি নট নড়ন চড়ন। আমাকে বললেন, ‘ভাড়া-টাড়া সম্পর্কে খবর নাও’। অমিও খবর নিলাম এই ভেবে যে, ভাড়ার কথা শুনলে সে আর এগোবেনা। এর মধ্যে অবশ্য ওকে বলেছিলাম, তার আগে তিনজন হাই কমিশনার, তিনজন ডেপুটি হাইকমিশনার বহুবার এবং একটি অস্ট্রেলীয় সংসদীয় দল একবার গাড়িতে করেই গোটা পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর করেছিল।

যাই হোক একদিনের জন্যে ভাড়া জানলাম প্রায় তিন লাখ টাকা। সেই সঙ্গে আমাদের চারজনের (হাইকমিশনার, ফার্স্ট সেক্রেটারী-অ্যাডমিন, ফার্স্ট সেক্রেটারী-এইড) এবং আমি) দৈনিক ভাতা, চট্টগ্রাম বিমানে যাওয়া আসা (কারণ, ফ্লিন চেয়েছিলেন আমরা চট্টগ্রামে আরো কিছু কাজ সেরে

হেলিকপ্টারে চড়বো, আর হেলিকপ্টার ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম গিয়ে আমাদের জন্যে বসে থাকবে) এই সব কিছু মিলিয়ে প্রায় সাড়ে তিন লাখ টাকার ধাক্কা। ভাড়া শোনার পরও ফ্লিন দুর্দমনীয়। হেলিকপ্টারে না উঠে ছাড়বেন না। আমাকে বললেন, 'তুমি ভাউচার সব তৈরী করে সই করে আমাকে দাও। তারপর সব ব্যবস্থা করো'। আমার সই দরকার ছিল। কিন্তু, আমি বেঁকে বসলাম। বললাম, 'এই অনৈতিক কাজ আমাকে দিয়ে হবেনা।' উনি ক্ষিপ্ত হলেন আমার ওপর বা ক্ষিপ্ত হবার সুযোগ পেলেন। তিনি নিজের প্রাধিকারবলেই ওই ভাউচার পাশ করলেন এবং আমরা সবাই প্রকল্প দেখার নামে হেলিকপ্টারে ভ্রমণ করলাম।

সেই থেকে ফ্লিন আমার ওপর ক্ষিপ্ত। পরিস্থিতি এমনই দাঁড়ালো যে, মান-সম্মান নিয়ে কাজ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। শুধুমাত্র সংসারের কথা ভেবে টিকে থাকার চেষ্টা করেছিলাম। না পেরে শেষ পর্যন্ত ছেড়েই দিলাম। তিন মাসের নোটিশ দিয়ে চাকুরী ছাড়লাম ২০০১ সালের অক্টোবর মাসের ১ তারিখে (তারিখটা ঠিক মনে নেই)। ছেড়েই চলে গিয়েছিলাম সিডনীতে, ম্যারিকভিলে ওয়ারেন রোডের অস্থায়ী নিবাসে। অস্ট্রেলীয় দুতাবাসের সাথে আমার দীর্ঘ সম্পর্ক ছিন্ন হলো চমৎকার দিনে, ৩১ ডিসেম্বর ২০০১। সেদিন রাতে আমি, ডালিয়া নিলুফার আর তার কয়েকজন বন্ধুসহ ডার্লিং হারবারে আতশবাজির খেলা দেখেই নতুন বছর উদযাপন শেষে ঘরে ফিরলাম। ওইদিন অবশ্য বনি হারবারে একটি নামকরা ইতালীয় রেস্তোরাঁয় আমার জন্যে দশ বোতল শাদা ও লাল ওয়াইনের ব্যবস্থা করে রেখেছিল, যার কোন সদগতি আমি করতে পারিনি। কেন? বাকি কথা পরে হবে আবার....কখনো। আর ফ্লিনের কথা! তার নাকি চাকুরী চলে গিয়েছিল আমি অস্ট্রেলীয় দুতাবাস ছাড়ার পরই। বিধাতার বিচার বড়োই নিষ্ঠুর, কি বলেন!

হিফজুর রহমান, ঢাকা, ২৩/০৮/২০১১, ইমেইল # hifzur@dhaka.net

হিফজুর রহমানের আগের লেখাটি পড়তে এখানে টোকামারুন